প্রাবন্ধিক

■ স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩ খ্রীঃ - ১৯০২ খ্রীঃ) ■

বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ ভারতবাসীর জীবনযুদ্ধের চিরসারথী। জীবনের দুর্গম পথে বিবেকানন্দ-সাহিত্য দুঃসাহসী মানবাত্মার জয়গান। তাঁর কম্বু-কণ্ঠে শুনি উপনিষদের সেই আশ্চর্য জাগরণের বাণী—"উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ্ নিবোধত।" সংসারপাশ-মুক্ত এই দৃপ্ত বেদান্তকেশরী জড়তা ও অজ্ঞানতার বিরুদ্ধেও ছিলেন সংগ্রামী সৈনিক। তিনি বলেন ঃ "Yes, the more everything seems to me to lie in manliness" বাংলা সাহিত্যে এবং জাতির জীবনে এই 'manliness' বা পৌরুষের আদর্শসঞ্চার সম্ভবত তাঁর সবচেয়ে স্মরণ-সুন্দর অবদান। তামসিকতা ও জড়তায় সমাচ্ছন্ন, পাপবোধে ন্যুব্জ মানুষের মধ্যে যেখানেই তিনি দেখেছেন পুরুষত্বের (manliness) অনুপস্থিতি, সেখানেই তাঁর মসী অসি হয়ে দেখা দিয়েছে। ঝিমিয়ে পড়া, সঙ্কীর্ণ সংস্কারে বাঁধা হিসেবী মনগুলো যেন তাঁর কলমের অপ্রত্যাশিত চাবুকের আঘাতে চমকে উঠেছে, দশ হাজার বছরের মমির মধ্যে জেগেছে প্রাণের স্পন্দন।

জন্ম ও কর্মজীবন ঃ স্বামী বিবেকানন্দের সন্ন্যাস-পূর্ব নাম ছিল নরেন্দ্রনাথ দত্ত। ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দের ১২ জানুয়ারি সোমবার উত্তর কলকাতার সিমলা পল্লীতে গৌরমোহন মুখার্জি লেনে সম্ভ্রান্ত দত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতামহ দুর্গাচরণ দত্ত ছিলেন ফার্সী ও সংস্কৃত ভাষার পণ্ডিত। পরিণত বয়সে গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাসী হন। নরেন্দ্রনাথের পিতা বিশ্বনাথ দত্ত ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের খ্যাতিমান অ্যাটর্নি। মা, ভুবনেশ্বরী দেবী।

রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক অবস্থার পরিচয়টি বিশ্লেষিত। সেইসঙ্গে আছে জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে ভারতবাসীকে নব-ভারত গঠনের পথ-নির্দেশ। 'ভাববার কথা' গ্রন্থে ধর্মীয় প্রসঙ্গ কৌতুকরসের দ্বারা ব্যাখ্যাত। আর 'পত্রাবলী'তে আছে শিষ্যকে বা সুহৃৎকে লেখা তাঁর অন্তরঙ্গ মনের পরিচয়।

বিশ্বন্ধর বিবেকানন্দের শৌর্য-দৃপ্ত ব্যক্তিত্ব তাঁর রচনাবলীতেও একটি বিশেষ বাগ্‌ভঙ্গী বা শৈলী সৃষ্টি করেছে যার তুলনা উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বা বিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধেও দুর্লভ। সাহিত্যের সৃষ্টিমূলক কল্পনাজগৎ বিবেকানন্দ-সাহিত্যে অনুপস্থিত। তাঁর গদ্য যেন লক্ষভেদী বাণ। তাঁর সমস্ত চলায়, বলায়, স্পর্শে ঠিকরে ওঠে প্রাণ। তাঁর ব্যক্তিত্বের মতো তাঁর গদ্যও পৌরুষব্যঞ্জক। আত্মশক্তির প্রতি অনন্ত বিশ্বাসের কথাই তার ধ্রুবপদ।

পূর্ববর্তী গদ্যলেখকদের থেকে স্বাতন্ত্র্য ঃ হৃদয়াবেগমূলক ভক্তিতন্ময়তা থেকে যুক্তিনিষ্ঠ জ্ঞানসাধনার দিকে বাঙালী মনকে আকৃষ্ট করার প্রথম সাধুবাদ ভারতপথিক রামমোহনেরই প্রাপ্য। প্রাক্-বিদ্যাসাগরী ভাষা ছিল নীরস "পণ্ডিতী বাংলা"। পরবর্তী যুগে বিদ্যাসাগরের লেখনী স্পর্শে সেই গদ্যের বুকে প্রাণসঞ্চার হয়। তাঁর বিতর্কমূলক রচনাবলীর মধ্যে শোনা যায় স্বামীজীর ক্ষীণ পদধ্বনি। আবার ভাষাকে ঐরাবতের গজেন্দ্রগমন থেকে অনেকটা মুক্তি দিলেন কালীপ্রসন্ন সিংহ ও প্যারীচাঁদ মিত্র। ভাঙ্গাচোরা চলতি মুখের কথা সাহিত্যে পেল প্রবেশের অধিকার। 'আলালী' ও 'বিদ্যাসাগরী' ভাষার মধ্যে সমন্বয় সাধন করে সাধুভাষার ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র করলেন এক নতুন পথনির্দেশ। এর পর চলতি গদ্যের মধ্যে গতিবেগের সাইক্লোন আনায় যিনি জনগণমন অধিনায়করূপে বাঙালী হৃদয়ে হলেন চির প্রতিষ্ঠিত, তিনি স্বামী বিবেকানন্দ। কলকাতার মার্জিত কথ্যবুলির উপরেই চলতি গদ্যকে তিনি দাঁড় করালেন। ভাষাকে দক্ষ নাবিকের মতো দিক চেনাতে বিবেকানন্দ-সাহিত্য বিকশিত। এই ভাষাটি কখনো তাঁর হাতে শাণিত তলোয়ার, কখনো কিছুটা তৎসম-শব্দযোগে-গম্ভীরনাদী তূর্য। কোমলে-কঠোরে তা যেন পার্বতী-পরমেশ্বরের মিলন।

যথার্থ চলতি গদ্যের যে কত শক্তি, কত বিচিত্র এর রূপাভিব্যক্তি, তার সার্থকতম নিদর্শন তাঁর গ্রন্থাবলী। তাঁর মতে সংস্কৃতের "গদাই লস্করি চাল" পরিত্যাগ করে "ভাষাকে করতে হবে যেন সাফ ইস্পাত, মুচ্‌ড়ে মুচ্‌ড়ে যা ইচ্ছে কর—আবার যে কে সেই, একচোটে পাথর কেটে দেয় দাঁত পড়ে না।" এই ইস্পাতের ঝলক বিবেকানন্দ-গদ্যেরও মুখ্য বৈশিষ্ট্য। বঙ্কিমচন্দ্র গদ্যের আপেক্ষিকতায় বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু এই আপেক্ষিকতার রহস্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন নি বঙ্কিমযুগের অনেক গদ্যলেখক। বঙ্কিমের সৃষ্ট তৎসম শব্দবহুল ও সমাসবদ্ধ গদ্যকেই তাঁরা বঙ্কিমের আদর্শ গদ্যরীতি বলে ভুল করেছেন। এই আপেক্ষিকতার মূল্য একমাত্র হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন বিবেকানন্দ। বঙ্কিমযুগে তিনি 'সবুজপত্র' যুগের আগমনী গাইলেও প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে তাঁর পার্থক্য সুস্পষ্ট। তাঁর চলিত গদ্যরীতি একেবারে কলকাতার খাঁটি "কক্‌নি", অথচ অশিষ্ট বা অমার্জিত নয়। তাঁর রীতিতে হুতোমী দুঃসাহসিকতা আছে কিন্তু নাগরালীর মেরুদণ্ডহীনতা অনুপস্থিত। প্রমথ চৌধুরীর মননশীলতা এ গদ্যে আছে কিন্তু ভাষার কৃত্রিম মারপ্যাঁচ সেখানে দুর্লভ।

বাংলা চলতি গদ্যের নব ভগীরথ স্বামীজী এর স্বপক্ষে যে অভ্রান্ত যুক্তি দেখিয়েছেন প্রাক্-"সবুজপত্র" যুগে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যভাষ্যেও তা বিরলদৃষ্ট। তাঁর "য়ুরোপপ্রবাসীর পত্র" অথবা "পশ্চিমযাত্রীর ডায়েরী" অথবা জীবনের বয়ঃসন্ধির

পত্রাবলীতে চলতি গদ্যের মধ্যে যে কমনীয়তা পরিস্ফুট তার মাধ্যমে বাংলা গদ্য অনেক আগেই চলতি পথের যাত্রী হতে পারত। এই চলতি গদ্যকে সাহিত্যের জীবনসঙ্গিনী করবার জন্য, সার্বজনীন অনুভূতির সঙ্গে চলতি গদ্যের 'গাঁটছড়া' বাঁধবার জন্য হুতোমের পর জ্বালাময় আবেগের অগ্নিস্পর্শে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন এই সন্ন্যাসী—"দুটো চলিত কথায় যে ভাবরাশি আসবে, তা দু-হাজার ছাঁদি বিশেষণেও নেই।" অথবা "চলিত ভাষায় কি আর শিল্পনৈপুণ্য হয় না? স্বাভাবিক ভাষা ছেড়ে একটা অস্বাভাবিক ভাষা তয়ের করে কি হবে?" ভাষাকে মেজে ঘষে সাফ্ ইস্পাতের মতো করতে চেয়েছেন তিনি। যার মাধ্যমে সাহিত্য পাবে বেগবতীর প্রাণ আর ভাষা পাবে মননশীলতার ঐশ্বর্য। সেই বিস্ময়কর বাকনির্মিতির ফসল বিবেকানন্দ-সাহিত্য—"বলি রঙের নেশা ধরেচে কখন কি-যে রঙের নেশায় পতঙ্গ আগুনে পুড়ে মরে, মৌমাছি ফুলের গারদে অনাহারে মরে?"—"একটি রেখার মধ্যে এত রঙের খেলা"—বিবেকানন্দ ছাড়া কেউ বাংলা সাহিত্যে দেখাতে পেরেছেন কি?

মানবতাবোধের দৃপ্ত বিশ্বাসে শান্ত শিব ও সুন্দরের ধ্যানমগ্ন এই বেদান্ত-পথিক আশ্চর্য-সুন্দর সাধু ভাষারও স্রষ্টা। তার নিঃসংশয় নিদর্শন তাঁর 'বর্তমান ভারত'। তবে তাঁর গদ্যভাষার অনায়াসগামিতা ও বেগ সবচেয়ে বেশি লক্ষ্য করা যায় চলিত ভাষায়। চলিত ভাষায় তিনি প্রাণময় বৈদ্যুতিক গতিসম্পন্ন; সাধুভাষায় সংহত শঙ্কর ভাষ্যের গভীর গম্ভীরতায় সমাসীন। তাঁর দ্বৈত গদ্যরীতি যেন তাঁর ব্যক্তিসত্ত্বারই দ্বৈত প্রকাশ। ওয়াল্টার পেটারের "Style is the man" কথাটি এখানে সুপ্রযোজ্য।

সাহিত্যিক হিসাবে এই যুগন্ধর চরম আদর্শবাদী। শুধুমাত্র 'হঠাৎ আলোর ঝলকানি'তেই তাঁর প্রবন্ধের আদিগন্ত আলোকিত হয়নি। বাস্তববাদী জীবন-জিজ্ঞাসা যেখানে মানুষের অন্নবস্ত্র ও বুদ্ধি হৃদয়ের সামঞ্জস্য বিধানে ব্যস্ত, এই মহামানবধর্মের উদ্‌গাতা সেখানে আত্মার আলোকে জীবনের পরম সত্যটিকে সাহিত্যের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করতে দৃঢ় সংকল্প। মানুষে মানুষে যে ভেদের অচলায়তন গড়ে উঠছে তা এই নবভারতের ঋত্বিককে ব্যথিত করত। তাঁর অন্তরতম আকাঙ্ক্ষা "নূতন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙ্গল ধরে, চাষার কুটির ভেদ করে, জেলে, মালা মুচি, মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালা উনুনের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে। বেরুক ঝোড়, জঙ্গল পাহাড় পর্বত থেকে..." বিবেকানন্দ-সাহিত্যে সেই অবহেলিত জাতি আর অবদমিত মানবাত্মার জীবনবেদ। এই অগ্নিবাণী বাংলা সাহিত্যের চিরন্তন সম্পদ।

চলিত ভাষাকে গভীর মননের উপযোগী করতে হলে সংস্কৃত থেকে আমাদের উপযুক্ত শর-সন্ধান করতেই হবে। পাশ্চাত্ত্য ভাষাকেও ল্যাটিনের দ্বারস্থ হতে হয়েছে। সংস্কৃতের সাহায্যে বাংলাভাষা হবে ওজস্বিনী এবং সংহত-গভীর। কোন শব্দকুহেলীর সৃষ্টি না করে জনসঙ্ঘের জাগৃতির জন্য উপনিষদের অগ্নিবর্ণ অক্ষরের সাহায্য নিয়েছিলেন স্বামীজী। বৈষ্ণব ভক্তিবাদের উচ্ছ্বসিত প্লাবনে বাঙালী জীবনে যে জড়তা দেখা দিয়েছিল তা স্মরণ করে তিনি রুদ্রবীণার ঝঙ্কারে উচ্চারণ করেছেন ঃ "দেশে দেশে গাঁয়ে গাঁয়ে যেখানেই যাবি দেখবি খোল করতালই বাজছে। ঢাক ঢোল কি দেশে তৈরি হয় না... কীর্ত্তন শুনে শুনে দেশটা যে মেয়েদের দেশ হয়ে গেল!" আবার বলেছেন—"ডমরু শিঙ্গা বাজাতে হবে।... যেসব music-এ মানুষের Soft feelings উদ্দীপিত করে সেসব কিছুদিনের জন্য এখন বন্ধ রাখতে হবে। ...সকল বিষয়ে বীরত্বের কঠোর মহাপ্রাণতা আনতে হবে।"

স্বামীজীর চলিত ভাষার প্রতি অনুরাগের মূলে ছিল জনগণের সঙ্গে একাত্মভাব। এই গণদৃষ্টিই চলিত ভাষার মূল কথা। কোমলকান্ত রূপের পরিবর্তে ঋজু ওজস্বিতা সাহিত্যে আনায় বাংলা গদ্য-সাহিত্য তাঁর কাছে চিরঋণী।

ভাষার ভারসাম্য না হারিয়ে সংস্কৃত সমাসবদ্ধ শব্দ আনায় তাঁর সাহিত্য কলমন্দ্রে মুখরিত। যেমন—হৃষীকেশের গঙ্গাতীর বর্ণনায় "কণপ্রত্যাশী মৎসকুল" অথবা মাঝে মাঝে ইংরেজী চলিত শব্দকে অসঙ্কোচে হজম করে নিয়ে এমন আতিথ্য তারা পেয়েছে যে তারা যে ঘরের নয় সেকথা ভুলেই গেছি।

হাস্যরস ঃ বিবেকানন্দের প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বের মধ্য থেকে মাঝে মাঝে হাস্যরসের "মেঘ-ছেঁড়া আলো" তাঁর প্রবন্ধে এসে পড়েছে। শুধু জ্ঞানময় নয় বলার ভঙ্গিটিও হয়ে উঠেছে মনোময় ও রসময়—"জাহাজ বেজায় দুলচে আর তু-ভায়া দুহাত দিয়ে মাথাটি ধোরে অন্নপ্রাশনের অন্নের পুনরাবিষ্কারের চেষ্টায় আছেন" অথবা মার্কিনী বর্ণ-বিদ্বেষের মধ্যে "চোখের জলে জমানো হাসির শিলাবৃষ্টি বোঝাতে গিয়ে" "যা কিছু সাহেব হবার সাধ ছিল, মিটিয়ে দিল মার্কিন ঠাকুর। দাড়ির জ্বালায় অস্থির, কিন্তু নাপিতের দোকানে ঢোকবামাত্রই বললে 'ও চেহারা এখানে চলবে না।" হাঙ্গর শিকারের বর্ণনায় চলিত ভাষার সাহায্যে সমগ্র ঘটনাটির গতিবেগ ও কৌতুকের আশ্চর্য নিপুণতায় উদ্‌ঘাটিত ঃ 'বাঘা হাঙর থ্যাবরা'কে "মুচকে হেসে, 'ভাল আছ তো হে' বলে সরে গেল।"

বিবেকানন্দের বিভিন্ন গ্রন্থের ব্যবহৃত গদ্যরীতির দৃষ্টান্ত ঃ সংস্কৃত ও ফরাসি মিশ্রিত শব্দ ব্যবহারে উজ্জ্বল চলিত গদ্য ঃ "লক্ষ্ণৌ শহরে মহরমের ভারি ধূম। বড় মসজিদ ইমামবাড়ায় জাঁকজমক রোশনির বাহার দেখে কে! বেসুমার লোকের সমাগম। এ দর্শকবৃন্দের ভিড়ের মধ্যে দূর গ্রাম হতে দুই ভদ্র রাজপুত তামাসা দেখতে হাজির। ঠাকুর সাহেবদের, যেমন পাড়াগেঁয়ে জমিদারের হয়ে থাকে, বিদ্যাস্থানে ভয়েবচ। সে-মোসলমানি সভ্যতা, কাফগাফের বিশুদ্ধ উচ্চারণসমেত লস্কির জবানের পুষ্পবৃষ্টি, আবাকাবাচোস্ত পায়জামা, তাজামোড়াসার রঙ্গবেরঙ্গ শহরপসন্দ্ ঢঙ্গ অত দূর গ্রামে গিয়ে ঠাকুর স্পর্শ করতে আজো পারেনি। কাজেই ঠাকুররা সরল, সিধে, সর্বদা স্বীকার করে জমামরদ কড়াজান আর বেজায় মজবুত দিল্।" ('প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য')

চিত্রধর্মী গদ্যরীতি ঃ "সে নীল নীল আকাশ, তার কোলে কালো মেঘ, তার কোলে সাদাটে মেঘ, সোনালী কিনারাদার, তার নীচে ঝোপ-ঝোপ তাল-নারিকেল-খেজুরের মাথা বাতাসে যেন লক্ষ লক্ষ চামরের মত হেলচে..." ('পরিব্রাজক')

ব্যঙ্গধর্মী ভাষারীতি ঃ "ঐ যে একদল দেশে উঠছে, মেয়েমানুষের মত বেশভূষা, নরম-নরম বুলি কাটেন, এঁকে বেঁকে চলেন, কারুর চোখের উপর চোখ রেখে কথা কইতে পারেন না, আর ভূমিষ্ঠ হয়ে অবধি পিরীতের কবিতা লেখেন, আর বিরহের জ্বালায় 'হাঁসেন হোঁসেন' করেন।" (পূর্বোক্ত)

সাধু ভাষার গদ্যরীতি ঃ "হে ভারত, ভুলিও না— তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দয়মন্তী; ভুলিও না তোমার উপাস্য উমানাথ সর্বত্যাগী শঙ্কর; ... বল মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই।" ('বর্তমান ভারত')

জাতির জীবনে ও বাংলা সাহিত্যে এই বীর ও রৌদ্ররসের স্পষ্টবক্তা সন্ন্যাসী বৈদিক ছন্দের মেঘমন্দ্রে প্রাণসঞ্চার করতে চেয়েছিলেন। জ্ঞান-ভক্তি, ধর্ম-কর্ম, আত্মস্থ সমাধি ও বিগলিত মানবপ্রেমের যুক্ত বেণীরূপে বিবেকানন্দ-সাহিত্য দোসরহীন।

বিশুদ্ধ সারস্বত প্রেরণায় লেখনী ধারণ না করলেও বিবেকানন্দ বাংলা সাহিত্যে এক জ্যোতির্ময় প্রেরণা। বাংলা ভাষা থেকে পৌরুষ আজ যখন অন্তর্হিত, তখন মনে পড়ে যায় Milton-এর সম্বন্ধে Wordsworth-এর ক্ষোভোক্তি—যা বাঙালী জাতির পক্ষ থেকে এদেশে স্বামীজীর সম্বন্ধেও প্রযোজ্য—"Milton ! thou should'st be living at this hour. England had need of thee."

■ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (১৮৬৪ খ্রীঃ-১৯১৯ খ্রীঃ) ■

তবে বক্তব্য-বিষয় নয় "যা প্রথম থেকে পাঠকের মনকে সজাগ ও মুগ্ধ রাখে সে হচ্ছে বিচার ও আলোচনার প্রকাশের ভঙ্গি" (প্রমথ চৌধুরীর 'প্রবন্ধ সংগ্রহ' প্রথম খণ্ড, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, ভূমিকা, পৃষ্ঠা ১০)।

একথা অনস্বীকার্য, বাংলা গদ্যের চলিত রীতিকে প্রতিষ্ঠিত করার আন্দোলনে প্রমথ চৌধুরী এবং তাঁর সম্পাদিত 'সবুজপত্রে'র ভূমিকা ছিল সর্বাগ্রে। কিন্তু কেবল নেতৃত্বদানের জন্যই নয়, এক স্বতন্ত্র ভাষা-রীতির স্রষ্টা রূপেও চৌধুরী মশাইয়ের অবদান ছিল অসামান্য। wit, paradox, epigram-এর দৃষ্টান্ত তাঁর রচনায় যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। তাঁর ভাষারীতির মধ্যে আছে (ক) আলঙ্কারিকতা ও উপমা ব্যবহারে অভিনবত্ব, (খ) স্পষ্টতা ও সত্যবাদিতা, (গ) ব্যঙ্গধর্মী বুদ্ধিদীপ্ত মানসিকতা, (ঘ) ঋজুতা ও শাণিত বাক্‌ভঙ্গি। তাঁর রচনা "witty as well as satiric." উইটের ব্যবহারে তাঁর ভাষারীতির মধ্যে যেমন একদিকে এসেছে ইস্পাতী উজ্জ্বলতা, অন্যদিকে উপেক্ষিত সত্যের মূর্তি বলার গুণে বিমুখ পাঠকের কাছেও আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে ঠিক যেন চেস্টারটনের ভাষায় "Truth standing on her head to attract attention." স্বভাবতই তাঁর প্রবন্ধে পড়ে পাঠকের মনে হয় "কথা বলাকে এখানে তিনি কথা কলায় পরিণত করেছেন" ('বাংলা সাহিত্যে প্রমথ চৌধুরী', রথীন্দ্রনাথ রায়)।

■ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭১ খ্রীঃ-১৯৫১ খ্রীঃ) ■

শিল্পের মধ্য দিয়ে ভারতাত্মার অনুসন্ধানেই শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের সমধিক পরিচিতি। সেখানে এই রূপশিল্পীর রঙ-তুলির সূক্ষ্ম কারুকার্যে মুগ্ধ হয় মন। আর শিল্পীর কল্পদৃষ্টি ভাষায় রঙ ছড়িয়ে ভাবনায় প্রাণ ভরিয়ে সৃষ্টি করে গদ্যের চিত্ররূপ বা চিত্রিত গদ্য। এখানেই অবনীন্দ্রনাথের গদ্যনিবন্ধের সার্থকতা।

জন্ম ঃ অসাধারণ চিত্রশিল্পী এবং গদ্যকার অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম ১৮৭১ খ্রীস্টাব্দের ৭ আগস্ট জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িতে। তিনি ছিলেন গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র। মা সৌদামিনী দেবী। পরিবারের শিল্প-সাহিত্য-সংগীতচর্চার পরিবেশেই তাঁর শিক্ষা শুরু হয়। পিতামহ গিরীন্দ্রনাথ ছিলেন ইউরোপীয় রীতিতে ল্যান্ডস্কেপ রচয়িতা। বড় দাদা গগনেন্দ্রনাথও ছিলেন উচ্চস্তরের শিল্পী। পারিবারিক প্রভাব এবং সহজাত শিল্পবোধে অবনীন্দ্রনাথ বাল্যকাল থেকেই চিত্রশিল্পের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। ১৮৮১-৯০ খ্রীস্টাব্দে সংস্কৃত কলেজে পড়ার সময় চিত্রাঙ্কনে মনোনিবেশ করেন। ১৮৯২-৯৪-এর মধ্যে তাঁর আঁকা অনেকগুলি চিত্র প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা'-র অলঙ্করণ, কৃষ্ণলীলা চিত্রাবলী, কচ ও দেবযানী, মুঘল চিত্রাবলী, আরব্য রজনীর চিত্রাবলী, বুদ্ধের জন্ম, বুদ্ধ ও সুজাতার চিত্র ইত্যাদি বেশ কয়েকটি স্মরণীয় চিত্র ভারতীয় শিল্পের সম্পদ ব'লে গণ্য হয়েছে। চিত্রকর অবনীন্দ্রনাথের প্রতিভার দ্বিতীয় দিকটি উদঘাটিত হয় গদ্যশিল্পী এবং কথকের পরিচয়ে। প্রকৃতপক্ষে, রবীন্দ্রনাথের পর ঠাকুরবাড়ির পুরুষ লেখকদের মধ্যে সম্ভবতঃ তিনি সবচেয়ে সফল এবং জনপ্রিয় লেখক হয়ে ওঠেন। শিশুসাহিত্যের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁর প্রেরণাদাতা ঃ "তুমি লেখ না, যেমন করে তুমি মুখে মুখে গল্প কর। তেমন করেই লেখ" ('জোড়াসাঁকোর ধারে')।

তাঁর সাহিত্যের আসরে প্রবেশ রূপকথার গল্পকার রূপে, আর প্রতিষ্ঠা কল্পগল্প সৃষ্টিতে। তাঁর দ্বিতীয় পর্যায়ের রচনা স্মৃতিচারণা। সেখানে নানাকথা আলাপের রীতিতে

হাসি আর বেদনার আলো-ছায়ায় রূপ নেয়। আবার শিল্পালোচনার সুগভীর তত্ত্ব ও রীতির পরিচয় সহজ ভঙ্গিমায় স্বাভাবিক বর্ণনায় প্রকাশ পায়।

■ **রচনাসমূহ** ■

(১) **রূপকথা গল্প-ইতিবৃত্তমূলক রচনা** ঃ 'শকুন্তলা' (১৮৯৫), 'ক্ষীরের পুতুল' (১৮৯৬, উৎস বুদ্ধু-ভুতুমের রূপকথা), 'রাজকাহিনী' (১৯০৯), 'ভূতপত্‌রীর দেশ' (১৯১৫), 'খাতাঞ্চির খাতা' (১৯১৬), 'বালক' (১৯১৬), 'পথে বিপথে' (১৯১৯), 'বুড়ো আংলা' (১৯৩৪, উৎস 'The Adventures of Neel')।

এছাড়া রবীন্দ্রনাথের উৎসাহে ও তাগাদায় লেখা এবং পড়া হয় বড়দের 'খামখেয়ালী সভায়'—'দেবী প্রতিমা'(বঙ্গাব্দ ১৩০৫) গল্প; ১৩১১-তে ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়— 'শিলাদিত্য', 'গোহ', 'পদ্মিনী', 'বাপ্পাদিত্য', 'আলেখ্য' প্রভৃতি গল্প। এর অনেকগুলি 'রাজকাহিনী' গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়।

পুঁথি ও পালাসাহিত্যের নিদর্শন ঃ 'চাইবুড়োর পুঁথি', 'মারুতির পুঁথি', 'মহাবীরের পুঁথি', 'উড়জচণ্ডীর পালা', 'গজকচ্ছপের পালা'।

(২) **স্মৃতিচারণা** ঃ 'ঘরোয়া' (১৯৪১), 'জোড়াসাঁকোর ধারে' (১৯৪৪), 'আপনকথা' (১৯৪৪)।

(৩) **শিল্পালোচনা ও প্রবন্ধগ্রন্থ** ঃ 'ভারতশিল্প' (১৯০৯), 'বাংলার ব্রত' (১৯১৯), 'বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী' (রচনাকাল ১৯২২-২৭, প্রকাশকাল ১৯২৯), 'ভারতশিল্পের ষড়ঙ্গ' (১৯৪৪)।

অবন ঠাকুরের 'ক্ষীরের পুতুল' প্রধানতঃ শিশু মনের উপযোগী। তাঁর 'খাতাঞ্চির খাতা' বা 'বুড়ো আংলা' সুনির্মল হাস্যরসে উদ্ভাসিত। সমালোচকের ভাষায়, "তাঁর কথ্যভাষার আর এক বৈশিষ্ট্য হাস্যরসের ক্ষেত্রে অপরূপ ইঙ্গিতগর্ভ বুদ্ধিদীপ্ত ব্যঞ্জনায় বিভাসিত, যার জ্যোতিতে আমাদের শিশুসাহিত্য চির-উজ্জ্বল হয়ে থাকবে" (শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায়, 'বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশ', পৃষ্ঠা ২০৮)।

তাঁর 'রাজকাহিনী' প্রকৃত অর্থে রাজস্থানের ইতিহাস নয়। ইতিহাস উপন্যাস রোমাঞ্চ চিত্রধর্ম মিলে-মিশে মায়ালোকের রূপকল্পনা মাত্র। তাঁর 'ভূতপত্‌রীর দেশ' উদ্ভট, অদ্ভুত এবং কবিকল্পনার সমন্বয়। তাঁর 'খাতাঞ্চির খাতা', 'বুড়ো আংলা' একসময় রসিক বাঙালী মনকে মাতিয়ে তুলেছিল।

স্মৃতিচারণমূলক রচনাগুলির মধ্যে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের পরিচয় তার সমকালের প্রেক্ষাপটে মূর্ত হয়। সেই যুগের অন্তরঙ্গ সমাজচিত্র রূপেও এইগুলির বিষয়মূল্য আছে ; যেমন রানীচন্দের সঙ্গে আলাপে তাঁর মুখ খোলা ঃ

"তখন এক সময়ে হঠাৎ দেখি সবাই স্বদেশী হুজুগে মেতে উঠেছে। এই স্বদেশী হুজুগটা যে কোথা থেকে এল কেউ আমরা তা বলতে পারিনে। এল এইমাত্র জানি, আর তাতে ছেলে বুড়ো মেয়ে, বড়লোক মুটে মজুর, সবাই মেতে উঠেছিল। সবার ভিতরেই যেন একটা তাগিদ এসেছিল। কিন্তু কে দিলে এই তাগিদ। সবাই বলে, হুকুম আয়া। আরে, এই হুকুমই বা দিলে কে, কেন। তা জানে না কেউ, জানে কেবল—হুকুম আয়া"।

বলার ভঙ্গী এখানে সম্পূর্ণ আলাপের। অথচ 'হুকুম আয়া' কথাটি রাগসঙ্গীতের বোলের মতোই বারে বারে ঘুরে ফিরে এসে এক রহস্যময়তা সৃষ্টি করে। বাংলা সাহিত্যে এই আলাপচারী লেখনরীতির অবনীন্দ্রনাথই সম্ভবতঃ প্রথম প্রবর্তক। পরবর্তী বাংলা সাহিত্যের আসর বা আড্ডা বা বৈঠক-রীতির এখান থেকেই হয়ত সংহত হওয়ার প্রেরণা পায়।

'জোড়াসাঁকোর ধারে'তে স্মৃতিচারণা আত্মমগ্নতায় প্রায়শই বিলীন। বাক্য সেখানে রূপ নেয় ছবির মতো ঃ "মনের কোণ থেকে বেরিয়ে এল সোনালি রূপোলি রঙ নিয়ে সুন্দরী একটি সন্ধ্যের পাখি—সে বাসায় ফিরছে। মনের এ কারখানা বুঝতে পারিনে। এত আলো, এত ভাব, সব তলিয়ে গিয়ে বের হল একটি পাখি, একটি কালো পাহাড়ের খণ্ড, আর তার গায়ে একগোছা সোনালি ঘাস। অনেক ছবিই আমার তাই—মনের তলা থেকে উঠে আসা বস্তু বলার গুণে ভাষা এখানে হয় প্রতীকনিষ্ঠ"।

'আপনকথা' নানা ভাবের ছড়িয়ে থাকা টুকরো ছবি ঃ মনের কথা, পদ্মদাসী, সাইক্লোন, উত্তরের ঘর, এ-আমল সে-আমল, এ-বাড়ি ও-বাড়ি, বারবাড়িতে, অসমাপিকা, বসত-বাড়ি ইত্যাদি বিভিন্ন নাম-পরিচয়ে প্রকাশ পায় ঠাকুরবাড়ির প্রায় পূর্ণচিত্র। অথচ ছবির মধ্যে হাসির ভাবটিও আছে চমৎকার; যেমন ঃ

"টিনের একটা খালি ক্যানেস্তারা কাদায় উলটে পড়ে আছে; পাতিহাঁস কটা হেলতে দুলতে এসে সেই কাদাজলে নাইতে লেগে যায়। থেকে থেকে মাথা ডোবায় জলে আর তোলে, ল্যাজের পালক কাঁপায়, শেষে এক-পায়ে দাঁড়িয়ে ভিজে মাথা, নিজের পিঠে ঘষে আর ঠোঁট দিয়ে গা চুলকে চলে। একটা বুড়ো রামছাগল ফস্ করে রাস্তা থেকে একটা লেখা কাগজ তুলে গিলে ফেলে চট্ পট্, তারপর গম্ভীরভাবে এদিক ওদিক চেয়ে চলে যায় সোজা ফটক পেরিয়ে রাস্তা বেড়াতে দুপুরবেলা।"

বাগেশ্বরী বইটি এইরকম আদ্যন্ত পরিহাসে জীবন্ত। 'শিল্প প্রবন্ধাবলী' গুরুগম্ভীর রচনা। কিন্তু চিত্রশিল্পীর কলমে যে তা লেখা, তা চোখের পলকে ধরা যায় ঃ

"বর্ষার মেঘ নীল পায়রার রং ধরে এল, শরতের মেঘ সাদা হাঁসের হালকা পালকের সাজে সেজে দেখা দিলে, কচি পাতা সবুজ ওড়না উড়িয়ে এল বসন্তে, নীল আকাশের চাঁদ রূপের নূপুর বাজিয়ে এল জলের উপর দিয়ে, কিন্তু এদের অপরূপ সাজ দেখবে যে সেই মানুষ এল নিরাভরণ, নিরাবরণ।"

এখানে গদ্যের চলতি রূপের মধ্যে সঙ্গীতময়তা (musical tone) শ্রব্যভাব (auditory) এবং গতিশীলতার (Kinesthetic) ইঙ্গিত দেখা গেছে। ভাষা এখানে প্রকৃতই চিত্রময় কবিতা। অবশ্য বাক্‌শিল্পী নিজেই ভাষায় দুটি ভাগের কথা বলেছেন—'সংকীর্তিত' এবং 'সংচিত্রিত' ভাষা। তাঁর মতে, আদিম ভাষার কথ্য রূপ সংকীর্তিত আর লেখ্যরূপ সংচিত্রিত। চিত্রশিল্পী তাই তাঁর লেখার রূপটিকে সর্বাংশে চিত্রের উপাদানে সজ্জিত করেছেন। বাংলা গদ্যসাহিত্যের ক্ষেত্রে এখানেই আছে তাঁর অভিনব অবদান।

■ স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩ খ্রীঃ - ১৯০২ খ্রীঃ) ■

বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ ভারতবাসীর জীবনযুদ্ধের চিরসারথী। জীবনের দুর্গম পথে বিবেকানন্দ-সাহিত্য দুঃসাহসী মানবাত্মার জয়গান। তাঁর কম্বু-কণ্ঠে শুনি উপনিষদের সেই আশ্চর্য জাগরণের বাণী—"উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ্ নিবোধত।" সংসারপাশ-মুক্ত এই দৃপ্ত বেদান্তকেশরী জড়তা ও অজ্ঞানতার বিরুদ্ধেও ছিলেন সংগ্রামী সৈনিক। তিনি বলেন ঃ "Yes, the more everything seems to me to lie in manliness" বাংলা সাহিত্যে এবং জাতির জীবনে এই 'manliness' বা পৌরুষের আদর্শসঞ্চার সম্ভবত তাঁর সবচেয়ে স্মরণ-সুন্দর অবদান। তামসিকতা ও জড়তায় সমাচ্ছন্ন, পাপবোধে ন্যুব্জ মানুষের মধ্যে যেখানেই তিনি দেখেছেন পুরুষত্বের (manliness) অনুপস্থিতি, সেখানেই তাঁর মসী অসি হয়ে দেখা দিয়েছে। ঝিমিয়ে পড়া, সঙ্কীর্ণ সংস্কারে বাঁধা হিসেবী মনগুলো যেন তাঁর কলমের অপ্রত্যাশিত চাবুকের আঘাতে চমকে উঠেছে, দশ হাজার বছরের মমির মধ্যে জেগেছে প্রাণের স্পন্দন।

জন্ম ও কর্মজীবন ঃ স্বামী বিবেকানন্দের সন্ন্যাস-পূর্ব নাম ছিল নরেন্দ্রনাথ দত্ত। ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দের ১২ জানুয়ারি সোমবার উত্তর কলকাতার সিমলা পল্লীতে গৌরমোহন মুখার্জি লেনে সম্ভ্রান্ত দত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতামহ দুর্গাচরণ দত্ত ছিলেন ফার্সী ও সংস্কৃত ভাষার পণ্ডিত। পরিণত বয়সে গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাসী হন। নরেন্দ্রনাথের পিতা বিশ্বনাথ দত্ত ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের খ্যাতিমান অ্যাটর্নি। মা, ভুবনেশ্বরী দেবী।